



বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ- ১৯৭৩ ॥ প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে নানারকম প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আমরা জানি ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে আইন দ্বারা পরিচালিত হতো সে আইনগুলোকে আমরা বলতাম 'কালো আইন'। ওই আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোনরকম স্বাধীনতা ছিল না। সরকার নিয়োজিত উপাচার্যের তখন প্রচণ্ড দাপট এবং



প্রফেসর ড. আবদুল খালেক

সীমাহীন ক্ষমতা ছিল। উপাচার্যের কথার বাইরে শিক্ষকদের যাওয়ার কোন উপায় ছিল না। তিনি যাকে ইচ্ছে বিভাগীয় প্রধান করতে পারতেন, যাকে ইচ্ছে অনুযায়ী মুহুরের ডিন নিয়োগ দিতে পারতেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের কাছ থেকে প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের একটি রূপরেখা চেয়ে নিয়েছিলেন। সেই রূপরেখার আলোকেই অধ্যাদেশটি চূড়ান্ত করা হয়। তবে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন সিনেট থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে তিনজনের একটি প্যানেল চ্যাসেলরের কাছে পাঠাতে হবে। তিনজনের মধ্য থেকে চ্যাসেলর মহোদয় যে কোন একজনকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দান করবেন।

উপাচার্য নিয়োগের বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শটি শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নেতারা অন্যদের সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭৩ অধ্যাদেশটির কার্যক্রম শুরু হতে না হতেই ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট তারিখে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে দেশে শুরু হয় সামরিক শাসন। সামরিক শাসন জারি হবার পর জেনারেল জিয়া ১৯৭২ সালের সংবিধানে নানা পরিবর্তন নিয়ে আসে, তবে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ব্যাপারে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন কঠোর অবস্থান গ্রহণ করার

করবেন। বিলম্বে হলেও প্রফেসর আরেফিন সিদ্দিক সিনেটের মাধ্যমে নির্বাচিত তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি প্যানেল মাননীয় চ্যাসেলরের কাছে পাঠিয়েছিলেন। প্যানেলে প্রফেসর আরেফিন সিদ্দিকের নাম ছিল। যেহেতু তিনি অস্থায়ীভাবে কর্মরত উপাচার্য ছিলেন, তাঁকেই চ্যাসেলর চার বছর মেয়াদে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দান করেন। এর ফলে ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশটি গতি পায়।

প্রফেসর আরেফিন সিদ্দিকের গতিশীল নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভালই চলছিল। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ যখন বৃহত্তর পারেন প্রফেসর আরেফিন সিদ্দিক সিনেট নির্বাচনের মাধ্যমে আরও এক টার্ম উপাচার্য হতে আগ্রহী, প্রগতিশীল শিক্ষকদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে এক ধরনের বিভাজন দেখা দেয়। আমরা পত্র-পত্রিকার খবরাখবর থেকে জেনেছি সিনেটের শিক্ষক সদস্য নির্বাচনের সময় প্রগতিশীল শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজন এতটা মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, শেষ পর্যন্ত শিক্ষকদের বিভাজন ঠেকাতে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন কোনরকমে পার করা গেলেও সিনেট কর্তৃক উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে জটিলতা দেখা দেয় তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী। প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ যখন বৃহত্তর পারেন কর্মরত উপাচার্য সিনেটের মাধ্যমে তৃতীয়বারের মতো উপাচার্য হতে আগ্রহী, তখন প্রগতিশীল শিক্ষকদের বেশ কিছু সদস্য সিনেট সভা বর্জন করেন। যে কারণে ইলেকশন নয় সিলেকশনের মাধ্যমে উপাচার্য প্যানেল তৈরি হয়। পত্র-পত্রিকার খবর থেকে জানা যায়, উপাচার্য নিয়োগের প্রতিজ্ঞা যখন চলছিল সেই সময় কতিপয় সিনেট সদস্য বিষয়টি আদালতে নিয়ে যান। আদালতের থেকে নির্দেশ আসে বিষয়টির মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কর্মরত উপাচার্য প্রফেসর আরেফিন সিদ্দিকের মেয়াদ শেষ হলেও তিনি তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন।

কিন্তু এর মধ্যে সমগ্র জাতি লক্ষ্য করেছে মাননীয় চ্যাসেলর মহোদয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর আক্তারুজ্জামানকে অস্থায়ীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দান করেছেন এবং প্রফেসর আক্তারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মাননীয় চ্যাসেলর এ ধরনের নিয়োগ দিতে পারেন কিনা অথবা এটি আদালতের অবমাননা হয়েছে কিনা। মনে রাখতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি চ্যাসেলর তিনি দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতিও রুটে। রাষ্ট্রপতি যেখানে চ্যাসেলর তাঁর আদেশকে উপেক্ষা করবার সুযোগ সম্ভবত আদালতেরও নেই। কাজেই এ পরিস্থিতিতে আইনের লঙ্ঘন আর বেশি দূর এগুতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে এসব ঘটনার

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার মতো মেধা এবং অভিজ্ঞতা অনেক শিক্ষকেরই রয়েছে। বিশেষ করে জীবনে একবার উপাচার্য হওয়ার প্রত্যাশা অভিজ্ঞ শিক্ষকদের থাকতেই পারে। তাদের বাদ দিয়ে যদি একই শিক্ষককে একাধিকবার উপাচার্য পদে নিয়োগ দেয়া হয় শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে বাধ্য। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। সম্প্রতি উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে পুনর্নিয়োগের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেড়ে গেছে। এর ফলে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

নানারকম চাপের মধ্যে দিন কাটাতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ছিল সে এক অস্বস্তিকর জীবন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে একটি গণতান্ত্রিক কল্যাণমুখী অধ্যাদেশ প্রণয়নের দাবি ওঠে। অধ্যাদেশের দাবিতে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে শুরু হয় আন্দোলন। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নেতারা। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সমন্বয়ে গঠিত হয় 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন'। ১৯৭২-৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তৎকালীন সভাপতি পরিসংখ্যান বিভাগের প্রফেসর মনোয়ার হোসেন। তখন আমি ছিলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একজন নির্বাচিত সদস্য। সেই সুবাদে ১৯৭৩ সালে অধ্যাদেশের দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার সঙ্গে আমারও গভীর সম্পৃক্ততা ছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশটি মোটেই সহজলভ্য ছিল না। অনেক আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশটি। আমরা জানি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিক্ষকদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন, শিক্ষকদের দাবি-দায়ের প্রতি তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। কারণ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, যাটের দশকের শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ অর্থাৎ প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও ছিল স্বর্ণোজ্বল ভূমিকা। ১৯৬৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ড. জোহার রক্ত দেশে একটি গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। সেই গণঅভ্যুত্থানের কারণেই আইউব খানের সামরিক শাসনের পতন ঘটে এং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তথা জেলখানা থেকে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ড. জোহার রক্ত দেশের রাজনীতির মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে যায়। উল্লেখ্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জোহা প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের কতটা নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর তা অজানা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই মুক্তিকামী ছাত্রদের পরিচর্যা করেছেন, শিক্ষকগণই ছাত্রদের দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলেছেন। ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বার্থসংরক্ষণ নয়, সিনেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও অংশীদারিত্ব থাকবে এমন কথা বঙ্গবন্ধুকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হয়। আমার যতদূর মনে পড়ে বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়

ফলে সামরিক সরকার ১৯৭৩ অধ্যাদেশটিতে কোনমুদ্রকম হস্তক্ষেপ করেনি। অধ্যাদেশের কার্যক্রম যথারীতি চলতে থাকে। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে অধ্যাদেশটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে তা পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশটি বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য নয়। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অধ্যাদেশটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অনুযায়ী মুহুরের ডিন নির্বাচন এবং বিভাগীয় সভাপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা থাকলেও উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভবত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাদেশটির কার্যক্রম প্রায় অকার্যকর হয়ে গেছে। উদাহরণ হিসেবে রাজশাহী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছি।

বাংলাদেশের এই দুটো বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৩ অধ্যাদেশ অনুযায়ী সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য নির্বাচনের যে বিধি ছিল সে বিধি প্রায় অকার্যকর হয়ে গেছে। বিধি অনুযায়ী প্রতি চার বছর পর সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য নির্বাচন হওয়ার কথা। আমার জানামতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের মাধ্যমে সর্বশেষ উপাচার্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৯ সালে। তখন আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৯৯৯ সালে সিনেট নির্বাচনের মাধ্যমে যে উপাচার্য প্যানেল আমি দিয়ে এসেছিলাম এরপর ১৭-১৮ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের মাধ্যমে আর কোন উপাচার্য প্যানেল তৈরি হয়নি। কাজেই বলা যেতে পারে সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য নির্বাচনের ধারাটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে অকার্যকর। এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে একটু দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। ২০০৯ সালে আগুয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রফেসর আ আম স আরেফিন সিদ্দিককে অস্থায়ীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করা হয়। মাননীয় চ্যাসেলর তাঁর নিজ ক্ষমতাবলে উপাচার্য নিয়োগ দিয়েছিলেন, তবে শর্ত ছিল দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য সিনেটের অধিবেশন ডেকে নির্বাচনের মাধ্যমে তিনজনের একটি উপাচার্য প্যানেল তৈরি করে চ্যাসেলর মহোদয়ের কাছে পাঠাবেন এবং সে প্যানেল থেকে মাননীয় চ্যাসেলর যে কোন একজনকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দান

মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকদের মধ্যে যে মর্যাদার লড়াই শুরু হয়েছে, একে ফাল্ট ধরেছে, তা সহজে মিটবার নয়। আমরা জানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের কাছে সমগ্র জাতির অনেক প্রত্যাশা আছে। উপাচার্য পদ নিয়ে তাঁদের মধ্যে যদি বিভাজন সৃষ্টি হয় তাতে দেশ এবং জাতির অনেক ক্ষতি হবে।

মণ্ড যুগের কবি ভারতচন্দ্র তাঁর এক কবিতায় উল্লেখ করেছেন- 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?' সমাজে যদি নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটেই থাকে সে অবক্ষয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্পর্শ করেনি এমন কথা হয়ত বলা যাবে না। তারপরও মনে রাখতে হবে দেশের সর্বোচ্চ মেধাবীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার মতো মেধা এবং অভিজ্ঞতা অনেক শিক্ষকেরই রয়েছে। বিশেষ করে জীবনে একবার উপাচার্য হওয়ার প্রত্যাশা অভিজ্ঞ শিক্ষকদের থাকতেই পারে। তাদের বাদ দিয়ে যদি একই শিক্ষককে একাধিকবার উপাচার্য পদে নিয়োগ দেয়া হয় শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে বাধ্য। এ ব্যাপারে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। সম্প্রতি উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে পুনর্নিয়োগের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেড়ে গেছে। এর ফলে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। সরকারকে বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে। এর রকম চলতে থাকলে অভিজ্ঞ সিনিয়র শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা ও নৈরাশ্য বেড়ে যাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে বিপর্যয় প্রভাব পড়তে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য নির্বাচনের বিষয়টি যে আজ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন, তাতে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য নির্বাচনের বিষয়টি অকার্যকর হয়ে যাবে কিনা, তা এখন দেখার বিষয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর আক্তারুজ্জামানের সত্যতার প্রতি আমরা আস্থা রাখতে চাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নিয়ে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে প্রফেসর আক্তারুজ্জামান সাহেবের প্রজ্ঞা এবং গতিশীল নেতৃত্বে আশা করি চলমান সঙ্কট কেটে যাবে।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও সাবেক ভিসি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়